আর রাহমান

৫৫

নামকরণ

প্রথম শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, এটি সেই সূরা যা "আর–রাহমান" শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। তাছাড়া সূরার বিষয়বস্তুর সাথেও এ নামের গভীর মিল রয়েছে। কারণ এ সূরার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার রহমতের পরিচায়ক গুণাবলী ও তার বাস্তব ফলাফলের উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

তাফসীর বিশারদগণ সাধারণতঃ এ সূরাটিকে মক্কী সূরা বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা ও কাতাদা থেকে কোন কোন হাদীসে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ তা সত্ত্বেও প্রথমত ঐ সব সম্মানিত সাহাবা থেকে আরো কিছু সংখ্যক হাদীসে বিপরীত বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ সূরার বিষয়বস্তু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের তুলনায় মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।এমন কি বিষয়বস্তুর বিচারে এটি মক্কী যুগেরও একেবারে প্রথম দিকের বলে মনে হয়। তাছাড়া বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, এটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে মক্কাতে নাযিল হয়েছিল। মুসনাদে আহমদে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন ঃ কা'বা ঘরের যে কোণে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত আমি হারাম শরীফের মধ্যে সে কোণের দিকে মুখ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তখনও পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে প্রকাশ্যে তা বলে দাও) নাযিল হয়নি। সে নামাযে মুশরিকরা তাঁর মুখ থেকে فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ কথাটি শুনেছিল। এ থেকে জানা যায় যে, এ সূরাটি সূরা আল হিজরের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল।

আল বায্যার, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, দারুকুতনী (ফিল আফরাদ), ইবনে মারদুইয়া এবং আল খাতীব (ফিত তারীখ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করলেন অথবা এ সূরাটি তাঁর সামনে পাঠ করা হলো। পরে তিনি লোকদের বললেন ঃ জিনরা তাদের রবকে যে জওয়াব দিয়েছিল তোমাদের নিকট থেকে সে রকম সুন্দর জওয়াব শুনছি না কেন? লোকেরা বললো, সে জওয়াব কি

ছিল। নবী (সা) বললেন ঃ যখনই আমি আল্লাহর বাণী فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পড়ছিলাম, জিনরা তার জবাবে বলছিল لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ আমরা আমাদের রবের কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না।"

তিরমিযী, হাকেম ও হাফেজ আবু বকর বায্যার হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনার ভাষা হচ্ছে ঃ সূরা রাহমানের তিলাওয়াত শুনে লোকজন যখন চুপ করে থাকলো তখন নবী (সা) বললেন ঃ

لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم ، كنت كلما اتيت على قوله فباى الاء ربكما تكذبان قالوا لابشىء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد -

" যে রাতে কুরআন শোনার জন্য জিনরা একত্রিত হয়েছিল, সে রাতে আমি জিনদের এ সূরা শুনিয়েছিলাম। তারা তোমাদের চেয়ে এর উত্তম জওয়াব দিচ্ছিল। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনাচ্ছিলাম হে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে" তখনই তারা জওয়াবে বলছিল ঃ হে আমাদের রব, আমরা তোমার কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না। সব প্রশংসা কেবল তোমারই।"

এ হাদীস থেকে জানা যায়, সূরা আহকাফে (২৯ থেকে ৩২ আয়াত) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেই সময় নবী (সা) নামাযে সূরা আর রাহমান পাঠ করছিলেন। এটা নবুওয়াতের ১০ম বছরের ঘটনা। সে সময় নবী (সা) তায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে "নাখলা" নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। যদিও অপর কিছু সংখ্যক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না যে, জিনেরা তাঁর নিকট থেকে কুরআন শরীফ শুনছে। বরং পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ কথা অবহিত করেছিলেন যে, জিনেরা তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলো কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যেভাবে জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন অনুরূপভাবে তাঁকে একথাও জানিয়েছিলেন যে, কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় তারা তার কি জওয়াব দিচ্ছিল। এরূপ হওয়াটা অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

এসব বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, সূরা আর রাহমান সূরা আল হিজ্র ও সূরা আহকাফের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এসব ছাড়া আমরা আরো একটি হাদীস দেখতে পাই যা থেকে জানা যায়, সূরা আর রাহমান মক্কী যুগের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা সমূহের একটি। ইবনে ইসহাক হযরত 'উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে এই মর্মে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবা কিরাম একদিন পরস্পর আলোচনা করলেন কুরাইশরা তো প্রকাশ্যে কখনো কাউকে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে একবার অন্তত তাদেরকে এ পবিত্র বাণী শোনাতে পারে? হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ আমি এ কাজ করবো। সাহাবা কিরাম বললেন ঃ তারা তোমার ওপর জুলুম করবে বলে আমাদের আশংকা হয়। আমাদের মতে, একাজ এমন কোন ব্যক্তির করা উচিত যার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী শক্তিশালী। কুরাইশরা যদি তার অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায় তাহলে তার গোষ্ঠীর লোকেরা যেন তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, আমাকেই একাজ করতে দাও আল্লাহ আমার হিফাজতকারী পরে বেশ কিছু বেলা হলে তিনি হারাম শরীফে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কুরাইশ নেতারা সেই সময় নিজ নিজ মজলিসে বসেছিল। হযরত আবদুল্লাহ মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে উচ্চস্বরে সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। আবদুল্লাহ কি বলছে কুরাইশরা প্রথমে তা বুঝার চেষ্টা করলো। পরে যখন তারা বুঝতে পারলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণী হিসেবে যেসব কথা পেশ করেন এটা সে কথা তখন তারা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার মুখের ওপর চপেটাঘাত করতে লাগলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ কোন পরোয়াই করলেন না। যতক্ষণ তাঁর সাধ্যে কুলালো ততক্ষণ তিনি তাদের কুরআন শুনিয়ে যেতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি তাঁর ফুলে উঠা মুখ নিয়ে ফিরে আসলে সংগী-সাথীরা বললো ঃ আমরা এ আশংকাই করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর এ দুশমনরা আমার কাছে আজকের চেয়ে অধিক গুরুত্বহীন আর কখনো ছিল না। তোমরা চাইলে আমি আগামীকাল আবার তাদেরকে কুরআন শোনাবো। সবাই বললো এ-ই যথেষ্ট হয়েছে। যা তারা আদৌ শুনতে চাইতো না তা তো তুমি শুনিয়ে দিয়েছো (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৬)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটাই কুরআন মজীদের একমাত্র সূরা যার মধ্যে মানুষের সাথে পৃথিবীর অপর একটি স্বাধীন সৃষ্টি জিনদেরকেও সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উভয়কেই আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা, তাঁর সীমা-সংখ্যাহীন দয়া ও অনুগ্রহ, তাঁর সামনে তাদের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব এবং তাঁর কাছে তাদের জবাবদিহির উপলব্ধি জাগ্রত করে তাঁর অবাধ্যতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে আর আনুগত্যের উত্তম ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যদিও পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে যা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, জিনরাও মানুষের মত স্বাধীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন দায়িত্বশীল সৃষ্টি, যাদেরকে কুফরী ও ঈমান গ্রহণের এবং আনুগত্য করার ও অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যেও মানুষের মতই কাফের ও ঈমানদার এবং অনুগত ও অবাধ্য আছে। তাদের মধ্যেও এমন গোষ্ঠী আছে যারা নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম ও আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান এনেছে। তবে এ সূরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন মজীদের দাওয়াত জিন ও মানুষ উভয়ের জন্য এবং নবীর (সা) রিসালাত শুধু মানবজাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

সূরার শুরুতে মানুষকে লক্ষ করেই সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারাই পৃথিবীর খিলাফত লাভ করেছে, তাদের মধ্যেই আল্লাহর রসূল এসেছেন এবং তাদের ভাষাতেই

আল্লাহর কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু পরে ১৩ আয়াত থেকে মানুষ ও জিন উভয়কেই সমানভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং উভয়ের সামনে একই দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ছোট ছোট বাক্যে একটি বিশেষ ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে ঃ

১ থেকে ৪ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআনের শিক্ষা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। এ শিক্ষার সাহায্যে তিনি মানব জাতির হিদায়াতের ব্যবস্থা করবেন এই তাঁর রহমতের স্বাভাবিক দাবী। কারণ বুদ্ধি বিবেচনা ও বোধশক্তি সম্পন্ন জীব হিসেবে তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৫ ও ৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার একক নির্দেশ ও কর্তৃত্বাধীনে চলছে। আসমান ও যমীনের সব কিছুই তার কর্তৃত্বাধীন। এখানে দ্বিতীয় আর কারো কর্তৃত্ব চলছে না।

৭ থেকে ৯ আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব–জাহানের গোটা ব্যবস্থাকে পূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যসহ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি দাবী করে যে, এখানে অবস্থানকারীরাও তাদের ক্ষমতা ও স্বাধীনতার সীমার মধ্যে সত্যিকার ভারসাম্য ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক এবং ভারসাম্য বিনষ্ট না করুক।

১০ থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিক ও তার পূর্ণতা বর্ণনা করার সাথে সাথে জিন ও মানুষ তাঁর যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সে দিকেও ইংগিত দেয়া হয়েছে।

২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এ মহাসত্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই বিশ্ব–জাহানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ–ই অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী নয় এবং ছোট বড় কেউ–ই এমন নেই যে তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত রাতদিন যা কিছু ঘটছে তা তাঁরই কর্তৃত্বে সংঘটিত হচ্ছে।

৩১ থেকে ৩৬ আয়াতে এ উভয় গোষ্ঠীকেই এই বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় অচিরেই আসবে যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। সবখানে আল্লাহর কর্তৃত্ব তোমাদের পরিবেষ্টন করে আছে। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে সটকে পড়ার সাধ্য তোমাদের নেই। তাঁর কর্তৃত্বের গণ্ডি থেকে পালিয়ে যেতে পারবে বলে যদি তোমাদের মধ্যে অহমিকা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে একবার পালিয়ে দেখ।

৩৭ ও ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে কিয়ামতের দিন।

যেসব মানুষ ও জিন দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করতো ৩৯ থেকে ৪৫ পর্যন্ত আয়াতে তাদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

যেসব সৎকর্মশীল মানুষ ও জিন পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করেছে এবং একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজের হিসেব দিতে হবে এ

উপলব্ধি নিয়ে কাজ করেছে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব পুরস্কার দিবেন, ৪৬ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ বক্তব্যের পুরোটাই বক্তৃতার ভাষায় পেশ করা হয়েছে। এটা একটা আবেগময় ও উচ্চমানের ভাষণ। এ ভাষণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির এক একটি বিস্ময়কর দিক, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের এক একটি নিয়ামত, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও পরাক্রমের এক একটি দিক এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহের এক একটি জিনিস বর্ণনা করে জিন ও মানুষকে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে : فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ । آلاء যে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ তা আমরা পরে আলোচনা করবো। এ ভাষণের মধ্যে এ শব্দটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। জিন ও মানুষের উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে একটি বিশেষ অর্থ বহন করছে।

اَلرَّحْمٰنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩

পরম দয়ালু (আল্লাহ) এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।[১] তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন[২] এবং তাকে কথা শিখিয়েছেন।[৩]

সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসেবের অনুসরণ করছে[৪] এবং তারকারাজি[৫] ও গাছপালা সব সিজদাবনত।[৬] আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং দাড়িপাল্লা কায়েম করেছেন।[৭] এর দাবী হলো তোমরা দাড়িপাল্লায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন করো এবং ওজনে কম দিও না।[৮]

১. অর্থাৎ এ কুরআনের শিক্ষা কোন মানুষের রচিত বা তৈরী নয়, বরং পরম দয়ালু আল্লাহ নিজে এর শিক্ষা দাতা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এ শিক্ষা কাকে দিয়েছেন এখানে সে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকেই মানুষ তা শুনছিলো। তাই অবস্থার দাবী অনুসারে আপনা থেকেই একথার প্রতিপাদ্য এই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

এ বাক্য দিয়ে সূচনা করার প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে একথা বলে দেয়া যে, নবী (সা) নিজে এর রচয়িতা নন, এ শিক্ষা দানকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাছাড়া আরো একটি উদ্দেশ্য আছে। 'রাহমান' শব্দটি সে দিকেই ইংগিত করছে। এটা নবীর (সা) রচিত কোন শিক্ষা নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে শুধু এতটুকু কথা বলার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার 'যাত' বা মূল নাম ব্যবহার না করে গুণবাচক নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা। তাছাড়া একান্তই গুণবাচক নাম ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে শুধু এ বিষয়টি প্রকাশের জন্য আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি নাম গ্রহণ করা

যেতে পারতো। কিন্তু যখন আল্লাহ, স্রষ্টা, বা রিযিকদাতা এ শিক্ষা দিয়েছেন বলার পরিবর্তে 'রাহমান' এ শিক্ষা দিয়েছেন বলা হয়েছে তখন আপনা থেকেই এ বিষয় প্রকাশ পায় যে, বান্দাদের হিদায়াতের জন্য কুরআন মজীদ নাযিল করা সরাসরি আল্লাহর রহমত। যেহেতু তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অতীব দয়াবান; তাই তিনি তোমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরার জন্য ছেড়ে দেয়া পছন্দ করেননি। তিনি তাঁর রহমতের দাবী অনুসারে এ কুরআন পাঠিয়ে তোমাদেরকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যার ওপরে পার্থিব জীবনে তোমাদের সত্যানুসরণ এবং আখেরাতের জীবনের সফলতা নির্ভরশীল।

২. অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষের স্রষ্টা, তাই স্রষ্টার দায়িত্ব হচ্ছে নিজের সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন করা এবং যে পথের মাধ্যমে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে সে পথ দেখানো। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের এ শিক্ষা নাযিল হওয়া শুধু তাঁর অনুগ্রহ পরায়ণতার দাবীই নয়, তাঁর স্রষ্টা হওয়ারও অনিবার্য এবং স্বাভাবিক দাবী। স্রষ্টা যদি সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করবে? তাছাড়া স্রষ্টা নিজেই যদি পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করতে পারে? স্রষ্টা যে বস্তু সৃষ্টি করলেন তিনি যদি তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার পন্থা–পদ্ধতি না শেখান তাহলে তাঁর জন্য এর চেয়ে বড় ক্রটি আর কি হতে পারে? সুতরাং প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বরং তাঁর পক্ষ থেকে যদি এ ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে সেটাই হতো বিস্ময়কর ব্যাপার। গোটা সৃষ্টিলোকে যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি। তাকে এমন উপযুক্ত আকার–আকৃতি দিয়েছেন যার সাহায্যে সে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অধীনে তার নিজের অংশের কাজ করার যোগ্য হতে পারে। সাথে সাথে সে কাজ সম্পাদন করার পন্থা পদ্ধতিও তাকে শিখিয়েছেন। মানুষের নিজের দেহের এক একটি লোম এবং এক একটি কোষকে (Cell) মানবদেহে যে কাজ আঞ্জাম দিতে হবে সে কাজ শিখেই তা জন্ম লাভ করেছে। তাই মানুষ নিজে কেমন করে তার স্রষ্টার শিক্ষা ও পথ নির্দেশ লাভ করা থেকে মুক্ত ও বঞ্চিত হতে পারে? এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে। সূরা লায়লে (১২ আয়াত) বলা হয়েছে . إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ "পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব।" সূরা নাহ্‌লে (৯ আয়াত) বলা হয়েছে ঃ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ সরল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। বাঁকা পথের সংখ্যা তো অনেক। সূরা ত্বা–হায় (৪৭–৫০ আয়াত) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন মূসার মুখে রিসালাতের পয়গাম শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমার সেই 'রব' কে যে আমার কাছে দূত পাঠায়? জবাবে হযরত মূসা বললেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ –

"তিনিই আমার রব যিনি প্রতিটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট আকার–আকৃতি দান করে পথ প্রদর্শন করেছেন।"

অর্থাৎ তিনি তাকে সেই নিয়ম–পদ্ধতি শিখিয়েছেন যার সাহায্যে সে বস্তু জগতে তার করণীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে। মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ

থেকে নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহ আসা যে সরাসরি প্রকৃতিরই দাবী, একজন নিরপেক্ষ মন-মগজের অধিকারী মানুষ এসব যুক্তি প্রমাণ দেখে সে বিষয়ে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হতে পারে।

৩. মূল আয়াতে بيان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করা। অর্থাৎ কোন কিছু বলা এবং নিজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট স্পষ্ট করে তোলা। এখানে এর অর্থ হচ্ছে ভাল মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যকার পার্থক্য। এ দু'টি অর্থ অনুসারে ক্ষুদ্র এ আয়াতাংশটি ওপরে বর্ণিত যুক্তি প্রমাণকে পূর্ণতা দান করে। বাকশক্তি এমন একটি বিশিষ্ট গুণ যা মানুষকে জীবজন্তু ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকূল থেকে পৃথক করে দেয়। এটা শুধু বাকশক্তিই নয়। এর পেছনে জ্ঞান ও বুদ্ধি, ধারণা ও অনুভূতি, বিবেক ও সংকল্প এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি কার্যকর থাকে যেগুলো ছাড়া মানুষের বাকশক্তি কাজ করতে পারে না। এজন্য বাকশক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষের জ্ঞানী ও স্বাধীন সৃষ্টজীব হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। আর আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষ গুণটি যখন মানুষকে দান করেছেন তখন এটাও স্পষ্ট যে, জ্ঞান ও অনুভূতি এবং ইখতিয়ারবিহীন সৃষ্টিকূলের পথ প্রদর্শনের জন্য শিক্ষার যে প্রকৃতি ও পদ্ধতি উপযুক্ত হতে পারে মানুষের শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি তা হতে পারে না। একইভাবে মানুষের আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ গুণ হলো আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে একটি নৈতিক অনুভূতি (Moral sense) সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার কারণে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, জুলুম ও ইনসাফ এবং উচিত ও অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করে এবং চরম গোমরাহী ও অজ্ঞতার মধ্যেও তার ভিতরের এ আত্মজ্ঞান ও অনুভূতি লোপ পায় না। এ দু'টি বিশেষ বৈশিষ্টের অনিবার্য দাবী হচ্ছে মানুষের জ্ঞানালোক সমৃদ্ধ ও স্বাধীন জীবনের জন্য শিক্ষাদানের পন্থা ও পদ্ধতি জন্মগতভাবে লব্ধ শিক্ষা পদ্ধতি— যার সাহায্যে মাছকে সাঁতার কাটা, পাখীকে উড়ে বেড়ানো এবং মানুষের নিজ দেহের মধ্যে চোখের পাতাকে পলক ফেলা, চোখকে দেখা, কানকে শোনা এবং পাকস্থলীকে হজম করা শেখানো হয়েছে—থেকে ভিন্ন হতে হবে। জীবনের এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেও শিক্ষক, বই পুস্তক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা ও ধর্মীয় শিক্ষা, লেখা, বক্তৃতা, বিতর্ক ও যুক্তি প্রমাণের মত উপায় উপকরণকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে এবং শুধু জন্মগতভাবে লব্ধ জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে না। তাহলে মানুষের স্রষ্টার ওপরে তাদের পথ প্রদর্শনের যে দায়িত্ব বর্তায় তা সম্পাদন করার জন্য যখন তিনি রসূল ও কিতাবকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন তখন তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন? সৃষ্টি যেমন হবে তার শিক্ষাও তেমন হবে এটা একটা সহজ যুক্তিগ্রাহ্য কথা। بيان যে সৃষ্টিকে শেখানো হয়েছে তার জন্য 'কুরআন'ই হতে পারে শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম। যেসব সৃষ্টিকে 'বায়ান' শেখানো হয়নি তাদের উপযোগী শিক্ষা মাধ্যম 'বায়ান' শেখানো হয়েছে এমন সৃষ্টির জন্য উপযোগী হতে পারে না।

৪. অর্থাৎ এসব বিরাট বিরাট গ্রহ উপগ্রহ একটা অত্যন্ত শক্তিশালী নিয়মবিধি ও অপরিবর্তনীয় শৃংখলার বাঁধনে আবদ্ধ। মানুষ সময়, দিন, তারিখ এবং ফসলাদি ও

মওসূমের হিসেব করতে সক্ষম হচ্ছে এ কারণে যে, সূর্যের উদয়াস্ত ও বিভিন্ন রাশি অতিক্রমের যে নিয়ম কানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাতে কোন সময়ই কোন পরিবর্তন হয় না। পৃথিবীতে অসংখ্য জীব–জন্তু বেঁচেই আছে এ কারণে যে, চন্দ্র ও সূর্যকে ঠিকমত হিসেব করে পৃথিবী থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে এবং একটি সঠিক মাপ জোকের মাধ্যমে বিশেষ শৃংখলার সাথে এ দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। কোন হিসেব নিকেশ ও মাপজোক ছাড়াই যদি পৃথিবী থেকে এদের দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতো তাহলে কারো পক্ষেই এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। অনুরূপভাবে পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ও সূর্যের গতি বিধিতে এমন পূর্ণ ভারসাম্য কায়েম করা হয়েছে যে, চন্দ্র একটি বিশ্বজনীন পঞ্জিকায় রূপান্তরিত হয়েছে যা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিরাতে সমগ্র বিশ্বকে চান্দ্র মাসের তারিখ নির্দেশ করে দেয়।

৫. মূল আয়াতে النجم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সর্বজন বিদিত ও সহজ বোধগম্য অর্থ তারকা। কিন্তু আরবী ভাষায় এ শব্দটি দ্বারা এমন সব লতাগুল্ম ও লতিয়ে উঠা গাছকে বুঝানো হয় যার কোন কাণ্ড হয় না। যেমন ঃ শাক–সবজি, খরমুজ, তরমুজ ইত্যাদি। এখানে এ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, সুদ্দী ও সুফিয়ান সাওরীর মতে এর অর্থ কাণ্ডহীন উদ্ভিদরাজি। কেননা এর পরেই الشجر (বৃক্ষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার সাথে এ অর্থ বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপর দিকে মুজাহিদ, কাতাদা ও হাসান বাসরীর মতে এখানেও 'নাজ্‌ম' অর্থ পৃথিবীর লতাগুল্ম নয়, বরং আকাশের তারকা। কারণ এটাই এর সহজ বোধগম্য ও সর্বজন বিদিত অর্থ। এ শব্দটি শোনার সাথে সাথে মানুষের মন–মগজে এ অর্থটিই জেগে ওঠে এবং সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখের পর তারকাসমূহের উল্লেখ করাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মুফাসসির ও অনুবাদকদের অধিকাংশই যদিও প্রথম অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একে ভ্রান্ত বলা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাফেজ ইবনে কাসীরের এ মতটি সঠিক যে, ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয় বিচারেই দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক অগ্রগণ্যতা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। কুরআন মজিদের অন্য একটি স্থানেও তারকা ও বৃক্ষরাজির সিজদাবনত হওয়ার উল্লেখ আছে এবং সেখানে نجوم শব্দটি তারকা ছাড়া অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ....

.....................(الحج:١٨)

এখানে সূর্য ও চন্দ্রের সাথে نجوم শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং شجر শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে পাহাড় ও জীবজন্তুর সাথে। আর বলা হয়েছে, এসব আল্লাহর সামনে সিজদাবনত।

৬. অর্থাৎ আকাশের তারকা ও পৃথিবীর বৃক্ষরাজি সবই আল্লাহর নির্দেশের অনুগত এবং তাঁর আইন-বিধানের অনুসারী। তাদের জন্য যে নিয়ম-বিধি তৈরী করে দেয়া হয়েছে তারা তা মোটেই লংঘন করে না।

এ দু'টি আয়াতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের গোটা ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার তৈরী এবং সব কিছু তাঁরই আনুগত্য করে চলেছে। পৃথিবী থেকে আসমান পর্যন্ত কোথাও কোন সার্বভৌম সত্তা নেই। অন্য কারো কর্তৃত্ব এ বিশ্বজাহানে চলছে না।, আল্লাহর কর্তৃত্বে কারো কোন রকম দখলও নেই, কারো এমন মর্যাদাও নেই যে, তাকে উপাস্য বানানো যায়। সবাই এক আল্লাহর বান্দা ও দাসানুদাস। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই সকলের মনিব। তাই তাওহীদই সত্য। আর কুরআনই তার শিক্ষা দিচ্ছে। এ শিক্ষা পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তিই শিরক অথবা কুফরীতে লিপ্ত হচ্ছে সে প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে লড়াইতে লিপ্ত আছে।

৭. প্রায় সব তাফসীরকারই এখানে "মীযান" (দাড়িপাল্লা) অর্থ করেছেন সুবিচার ও ইনসাফ এবং মীযান কায়েম করার অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহানের এই গোটা ব্যবস্থায় ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করেছেন। মহাকাশে আবর্তনরত এসব সীমা সংখ্যাহীন তারকা ও গ্রহ উপগ্রহ, বিশ্ব-জাহানে সক্রিয় এই বিশাল শক্তিসমূহ, এবং এ বিশ্বলোকে বিদ্যমান অসংখ্য সৃষ্টি ও বস্তুরাজির মধ্যে যদি পূর্ণমাত্রার সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা না হতো তাহলে এ জগত এক মুহূর্তের জন্যেও চলতে পারতো না। কোটি কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর বুকে বাতাস ও পানি এবং স্থলভাগে সৃষ্টিকুল আছে, তাদের প্রতি লক্ষ করুন। তাদের জীবন তো এ জন্যই টিকে আছে যে, তাদের জীবন ধারণের উপকরণের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে। এসব উপকরণের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ ভারসাম্যহীনতাও সৃষ্টি হয় তাহলে এখানে জীবনের নাম গন্ধ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।

৮. অর্থাৎ তোমরা যেহেতু এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বলোকে বাস করছো যার গোটা ব্যবস্থাপনাই সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তোমাদেরকেও সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে গণ্ডীর মধ্যে তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেখানে যদি তোমরা বে-ইনসাফী করো এবং যে হকদারদের হক তোমাদের হাতে দেয়া হয়েছে তাদের হক যদি তোমরা হরণ কর, তাহলে তা হবে বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ মহা বিশ্বের প্রকৃতি জুলুম, বে-ইনসফী ও অধিকার হরণকে স্বীকার করে না। এখানে বড় রকমের কোন জুলুম তো দূরের কথা, দাঁড়ি পাল্লার ভারসাম্য বিঘ্নিত করে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক তোলা পরিমাণ জিনিসও কম দেয় তাহলে সে বিশ্বলোকের ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। –এটা কুরআনের শিক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ তিনটি আয়াতে এ শিক্ষাটাই তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে তাওহীদ এবং দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে সুবিচার ও ইনসাফ। এভাবে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'রাহমান' বা পরম দয়াবান আল্লাহ পথ প্রদর্শনের জন্য যে কুরআন পাঠিয়েছেন তা কি ধরনের শিক্ষা নিয়ে এসেছে।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾
وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

পৃথিবীকে[৯] তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন।[১০] এখানে সব ধরনের সুস্বাদু ফল প্রচুর পরিমাণে আছে। খেজুর গাছ আছে যার ফল পাতলা আবরণে ঢাকা। নানা রকমের শস্য আছে যার মধ্যে আছে দানা ও ভূষি উভয়ই।[১১] অতএব, হে জিন ও মানব জতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে[১২] অস্বীকার করবে[১৩]?

৯. এখান থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সেসব নিয়ামত, অনুগ্রহ এবং তার অসীম শক্তির সেসব বিস্ময়কর দিকের উল্লেখ করা হচ্ছে যা মানুষ ও জিন উভয়েই উপভোগ করছে এবং যার স্বাভাবিক ও নৈতিক দাবী হলো, কুফরী বা ঈমান গ্রহণের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা যেন নিজেদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও ইচ্ছায় তাদের রবের বন্দেগী ও আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে।

১০. মূল কথাটি হলো পৃথিবীকে তিনি انام এর জন্য وضع (সংস্থাপিত) করেছেন। এখানে وضع বা সংস্থাপন করা বলতে বুঝানো হয়েছে সংযোজন করা, নির্মাণ করা, তৈরি করা, রাখা এবং স্থাপিত করা বা সেঁটে দেয়া। আর আরবী ভাষায় انام শব্দ দ্বারা সব সৃষ্টিকেই বুঝায়। এর মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সব প্রাণীকূল অন্তরভুক্ত। ইবনে আব্বাস বলেন : كُلُّ شَيْئٍ مَا فِيهِ الرُّوحُ প্রাণধারি সব সত্তাই انام হিসেবে গণ্য। মুজাহিদের মতে এর অর্থ সমস্ত সৃষ্টিকূল। কাতাদা, ইবনে যায়েদ ও শা'বীর মতে সমস্ত প্রাণীই انام (আনাম)। হাসান বাসারী বলেন : মানুষ ও জিন উভয়েই এর মধ্যে অন্তরভুক্ত। সমস্ত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এ থেকে জানা যায়, যারা এ আয়াতের সাহায্যে ভূমিকে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন করার নির্দেশ দিতে চান তারা অর্থহীন কথা বলেন। এটা বাইরের মতবাদ এনে জোরপূর্বক কুরআনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার একটি কদর্য্য প্রচেষ্টা। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী থেকে যেমন তা প্রমাণিত হয় না, তেমনি পূর্বাপর প্রসংগ দ্বারাও তা সমর্থিত হয় না। শুধু মানব সমাজকেই আনাম বলা হয় না, বরং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিও এর মধ্যে শামিল। পৃথিবীকে আনামের জন্য সংস্থাপিত করার অর্থ এ নয় যে, তা সবার সাধারণ মালিকানা। বাক্যের ভাবধারা থেকেও প্রকাশ পায় না যে, এখানে কোন অর্থনৈতিক নিয়ম-বিধি বর্ণনা করা এর উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে এখানে এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি ও প্রস্তুত করে দিয়েছেন যে, তা নানা প্রকারের প্রাণীকূলের বসবাস ও জীবন যাপনের উপযোগী হয়ে গিয়েছে। এ পৃথিবী আপনা থেকেই এরূপ হয়ে যায়নি, বরং স্রষ্টার বানানোর কারণেই এরূপ হয়েছে। তিনি নিজের জ্ঞান ও সৃষ্টি কৌশলের আলোকে এ পৃথিবীকে এ অবস্থানে সংস্থাপন করছেন এবং তার পৃষ্ঠদেশে এমন পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি করেছেন যার ফলশ্রুতিতে প্রাণধারী প্রজাতিসমূহের পক্ষে এখানে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন,

তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৩–৭৪; ইয়াসীন, টীকা ২৯–৩২; আল মু'মিন, টীকা ৯০–৯১; হা মীম আস সাজদা, টীকা ১১ থেকে ১৩ পর্যন্ত; আয যুখরুফ, টীকা ৭ থেকে ১০ পর্যন্ত; আল জাসিয়া, টীকা ৭)।

১১. অর্থাৎ মানুষের জন্য খাদ্য শস্য এবং পশুর ভুষিখাদ্য।

১২. মূল আয়াতে الاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এ শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আমরাও বিভিন্নস্থানে এর অর্থ বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করেছি। তাই এ শব্দটি কতটা ব্যাপক অর্থবোধক এবং কত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, তা শুরুতেই বুঝে নেয়া দরকার। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তাফসীর বিশারদগণ الاء শব্দের অর্থ করেছেন সাধারণত "নিয়ামতসমূহ"। সমস্ত অনুবাদক এ শব্দের অনুবাদও করেছন তাই। ইবনে আব্বাস, কাতাদা, হাসান বাসরী থেকে এর এই অর্থই বর্ণিত হয়েছে। এটি যে এ শব্দের সঠিক অর্থ তার বড় প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে জিনদের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াত শুনে তারা বারবার বলছিল ঃ لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ বর্তমান যুগের কোন কোন গবেষকের এ সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একমত নই যে, الاء শব্দটি নিয়ামত অর্থে আদৌ ব্যবহৃত হয় না।

এ শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, অসীম ক্ষমতা, অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিকসমূহ অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণতাসমূহ। ইবনে জারীর তাবারী ইবনে যায়েদের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, فَبِاَىِّ الاءِ رَبِّكُمَا অর্থ فَبِاَىِّ قُدْرَةِ اللهِ । ইবনে জারীর নিজেও ৩৭ ও ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় الاء শব্দটিকে অসীম ক্ষমতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইমাম রাযীও ১৪, ১৫ ও ১৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন "এ আয়াতগুলোতে নিয়ামতের বর্ণনা করা হয়নি, বরং অসীম ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ২২ ও ২৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের বর্ণনা করা হয়নি। বরং তার অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিকসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।"

এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে গুণাবলী, মহত গুণাবলী এবং পরিপূর্ণ ও মর্যাদা। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তাফসীরকারগণ এ অর্থ বর্ণনা করেননি। কিন্তু আরবদের কাব্যে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি নাবেগাহ বলেছেন ঃ

هم الملوك وابناء الملوك لهم : فضل على الناس فى الالاء والنعم

"তারা বাদশাহ এবং বাদশাহজাদা। প্রশংসনীয় গুণাবলী ও নিয়ামতের দিক দিয়ে মানুষের কাছে তাদের মর্যাদা আছে।"

মুহালহিল তার ভাই কুলাইবের জন্য রচিত শোকগাথায় বলেছেন ঃ

الحزم والعزم كانا من طبائعه : ما كل الائه ياقوم احصيها

"পরিণাম দর্শিতা ও দৃঢ়সংকল্প ছিল তার মহত গুণাবলীর অন্তরভুক্ত। হে লোকেরা, আমি তার সব মহত গুণ এখানে তুলে ধরছি না।"

ফাদালা ইবনে যায়েদ আল–আদওয়ানী দারিদ্র্যের মন্দ দিকসমূহ বর্ণনা প্রসংগে বলছেন যে, দরিদ্র মানুষ ভাল কাজ করলেও মন্দ বিবেচিত হয়। কিন্তু

وتحمد الاء البخيل المدرهم

সম্পদশালী কৃপণের অনেক গুণ–বৈশিষ্ট ও পরিপূর্ণতার প্রশংসা করা হয়।

আজদা' হামদানী তার "কুমাইত" নামের ঘোড়ার প্রশংসা প্রসংগে বলেন ঃ

ورضيت الاء الكميت فمن يبع : فرسا فليس جوادنا بمباع

"আমি 'কুমাইতে'র উত্তম গুণাবলী পছন্দ করি। কেউ কোন ঘোড়া বিক্রি করতে চাইলে করুক। আমাদের ঘোড়া বিক্রি করা হবে না।"

হাম্মাসার এক কবি আবু তামাম যার নাম উল্লেখ করেনি তার শ্রদ্ধেয় ও প্রশংসনীয় ব্যক্তি ওয়ালীদ ইবনে আদহামের ক্ষমতা ও কতৃত্বের শোকগাথায় বলেছেন ঃ

اذا ما امرؤ اثنى بالاء ميت : فلا يبعد الله الوليدبن ادهما

"যখনই কেউ কোন মৃত ব্যক্তির গুণাবলীর প্রশংসা করবে আল্লাহ না করুন, সে যেন ওয়ালীদ ইবনে আদহামকে ভুলে না যায়।"

فما كان مفراحا اذا الخير مسه : ولا كان منانا اذا هو انعما

"সুদিন আসলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ো না এবং কারো প্রতি অনুগ্রহ করে থাকলে কখনো খোঁটা দিয়ো না।"

কবি তারাফা এক ব্যক্তির প্রশংসা উপলক্ষে বলেন ঃ

كامل يجمع الاء الفتى : نبه سيد سادات خضم

"সে পূর্ণাঙ্গ ও নিষ্কলুষ, সাহসিকতার সমস্ত গুণাবলীর সমাহার, অভিজাত, নেতাদের নেতা এবং উদারমনা।"

এসব প্রমাণাদি ও দৃষ্টান্তাবলী সামনে রেখে الاء শব্দটিকে আমরা তার ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থান–কাল–পাত্র ভেদে যে অর্থটি যথোপযুক্ত মনে হয়েছে অনুবাদে সেটিই লিপিবদ্ধ করেছি। তা সত্ত্বেও কোন কোন জায়গায় একই স্থানে الاء শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। অনুবাদের বাধ্যবাধকতার কারণে আমাকে তার একটি অর্থই গ্রহণ করতে হয়েছে। কেননা, যুগপত সবগুলো অর্থই ধারণ করতে পারে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় এরূপ ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আলোচ্য আয়াতটিতে পৃথিবী সৃষ্টি এবং সেখানকার সমস্ত সৃষ্টির রিযিক সরবরাহের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ الاء কে অস্বীকার করবে? এক্ষেত্রে الاء শব্দটি শুধুমাত্র নিয়ামত অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণতা এবং তাঁর মহৎ গুণাবলীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এটি তাঁর অসীম ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ যে, তিনি এই মাটির পৃথিবীকে এমন বিস্ময়কর পন্থায় তৈরী করেছেন যেখানে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীকূল বাস করে এবং নানা রকমের ফল ও শস্য উৎপন্ন হয়। এটাও তাঁর প্রশংসনীয় গুণ যে, তিনি এসব প্রাণীকূলকে

সৃষ্টি করার সাথে সাথে এখানে তাদের লালন-পালন এবং রিযিক সরবরাহেরও ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থাপনাও এমন ব্যাপক ও নিখুঁত যে, তাদের খাদ্যে কেবল খাদ্য গুণ ও পুষ্টিই নয়, বরং তার মধ্যে প্রবৃত্তি ও রসনার তৃপ্তি আছে এবং আছে অগণিত দৃষ্টিলোভা দিক। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কারিগরী ও নৈপুন্যের চরম পূর্ণতার একটি মাত্র দিকের প্রতি নমুনা হিসেবে ইংগিত দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে খেজুর গাছে পাতলা আবরণে আচ্ছাদিত করে ফল সৃষ্টি করা হয়। এই একটি মাত্র উদাহরণকে সামনে রেখে একটু লক্ষ করুন, কলা, দাড়িম্ব, কমলালেবু, নারিকেল এবং অন্যান্য ফলের প্যাকিংয়ে কি রকম নৈপুন্য ও শৈল্পিক কারুকার্যের পরাকাষ্ঠা ও উৎকর্ষতা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া নানা রকমের খাদ্য শস্য, ডাল এবং বীজ যা আমরা পরিতুষ্টির সাথে অবলীলাক্রমে রান্না করে খাই তার প্রত্যেকটিকে উৎকৃষ্ট ও পরিচ্ছন্ন আঁশ ও ছালের আকারে প্যাক করে এবং অতি সুক্ষ্ম আবরণে জড়িয়ে সৃষ্টি করা হয়।

১৩. অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ, তাঁর অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর কার্যাবলী এবং মহৎ গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানুষের কতিপয় আচরণ। যেমন ঃ

এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা যে মহান আল্লাহ, অনেকে তা আদৌ স্বীকার করে না। তাদের ধারণা, এসবই বস্তুর আকস্মিক বিশৃংখলার কিংবা একটা দুর্ঘটনার ফল যার মধ্যে জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার কোন হাত নেই। এ ধরনের উক্তি একেবারে খোলাখুলি অস্বীকৃতির নামান্তর।

কিছু সংখ্যক লোক এ কথা স্বীকার করে যে, এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তবে তারা এর সাথে সাথে অন্যদেরকেও খোদায়ীতে শরীক মনে করে, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্যদের কাছে এবং তাঁর দেয়া রিযিক খেয়ে অন্যের গুণ গায়। এটা অস্বীকৃতির আরেকটি রূপ। কোন লোক যখন স্বীকার করে যে, আপনি তার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছেন এবং তখনি আপনার সামনেই সেজন্য অন্য কোন লোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করে—অথচ প্রকৃত পক্ষে সে তার প্রতি আদৌ অনুগ্রহ করেনি—তাহলে আপনি নিজেই বলবেন যে, সে জঘন্য অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে। কারণ তার এ আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সে আপনাকে নয় বরং সে ব্যক্তিকেই অনুগ্রহকারী স্বীকার করে যার প্রতি সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

আরো কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকেই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে, কিন্তু তাদেরকে নিজেদের সৃষ্টি ও পালনকর্তার আদেশ নিষেধের আনুগত্য এবং তাঁর হিদায়াতসমূহের অনুসরণ করতে হবে তা মানে না। এটা অকৃতজ্ঞতা ও নিয়ামত অস্বীকার করার আরো একটি রূপ। কারণ, যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে নিয়ামতসমূহ স্বীকার করা সত্ত্বেও নিয়ামত দাতার অধিকারকে অস্বীকার করে।

আরো এক শ্রেণীর মানুষ মুখে নিয়ামতকে অস্বীকার করে না কিংবা নিয়ামত দানকারীর অধিকারকেও অস্বীকার করে না। কিন্তু কার্যত তাদের এবং একজন অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মিথ্যানুসারীর জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য থাকে না। এটা মৌখিক অস্বীকৃতি নয়, কার্যত অস্বীকৃতি।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ⑭ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ⑮ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ⑯ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ⑰ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ⑱

মাটির শুকনো ঢিলের মত পচা কাদা থেকে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১৪] আর জিনদের সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে[১৫]। হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের অসীম ক্ষমতার কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিক অস্বীকার করবে?[১৬]

দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল— সব কিছুর মালিক ও পালনকর্তা তিনিই।[১৭] হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ কুদরতকে[১৮] অস্বীকার করবে?

১৪. কুরআন মজীদে মানুষ সৃষ্টির যে প্রাথমিক পর্যায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য একত্রিত করে তার নিম্নবর্ণিত ক্রমিক বিন্যাস অবগত হওয়া যায় (১) তুরাব অর্থাৎ মাটি। (২) ত্বীন অর্থাৎ পচা কর্দম যা মাটিতে পানি মিশিয়ে বানানো হয়। (৩) ত্বীন লাযেব-আঠালো কাদামাটি। অর্থাৎ এমন কাদা, দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে যার মধ্যে আঠা সৃষ্টি হয়ে যায় (৪) حماٍ مسنون যে কাদার মধ্যে গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায় (৫) صلصال من حماٍ مسنون كالفخار অর্থাৎ পচা কাদা যা শুকিয়ে যাওয়ার পরে মাটির শুকনো ঢিলার মত হয়ে যায়। (৬) بشر মাটির এ শেষ পর্যায় থেকে যাকে বানানো হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার মধ্যে তাঁর বিশেষ রূহ ফুৎকার করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে যাকে সিজদা করানো হয়েছিল এবং তার সমজাতীয় থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছিল (৭) ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين তারপর পরবর্তী সময়ে নিকৃষ্ট পানির মত সংমিশ্রিত দেহ নির্যাস থেকে তার বংশ ধারা চালু করা হয়েছে। এ কথাটি বুঝাতে অন্য স্থানসমূহে نطفه (শুক্র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

মানব সৃষ্টির এ পর্যায়সমূহ অবগত হওয়ার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ পর্যায়ক্রমে পাঠ করুন। كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ (ال عمران : ٥٩) بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ (السجده : ٧) اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَازِبٍ (الصفات:١١) চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তার পরের পর্যায়গুলো নীচের আয়াত সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ (ص : ٧١-٧٢) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً (النساء : ١) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ (السجدة : ٨) فَانَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ (الحج : ٥)

১৫. মূল আয়াতে مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। نار অর্থ এক বিশেষ ধরনের আগুন। কাঠ বা কয়লা জ্বালালো যে আগুন সৃষ্টি হয় এটা সে আগুন নয়। আর مارج অর্থ ধোঁয়াবিহীন শিখা। এ কথার অর্থ হচ্ছে প্রথম মানুষকে যেভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার মাটির সত্তা অস্থি–মাংসে তৈরী জীবন্ত মানুষের আকৃতি লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে শুক্রের সাহায্যে তার বংশধারা চালু আছে। অনুরূপ প্রথম জিনকে নিছক আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তার বংশধরদের থেকে পরবর্তী সময়ে জিনদের অধস্তন বংশধররা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। মানব জাতির জন্য আদমের মর্যাদা যা, জিন জাতির জন্য সেই প্রথম জিনের মর্যাদাও তাই। জীবন্ত মানুষ হয়ে যাওয়ার পর হযরত আদম এবং তার বংশ থেকে জন্ম লাভকারী মানুষের দেহের সেই মাটির সাথে যেমন কোন মিল থাকলো না যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এখনো আমাদের দেহ পুরোটাই মাটির অংশ দ্বারাই গঠিত। কিন্তু মাটির ঐ সব অংশ রক্ত–মাংসের দেহে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর তা শুধু মাটির দেহ না থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসে রূপান্তরিত হয়েছে। জিনদের ব্যাপারটাও তাই। তাদের সত্তাও মূলত আগুনের সত্তা। কিন্তু আমরা যেমন মাটির স্তূপ নই, অনুরূপ তারাও শুধু অগ্নি শিখা নয়।

এ আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা যায় ঃ এক, জিনেরা নিছক আত্মিক সত্তা নয়, বরং তাদেরও এক ধরনের জড় দেহ আছে। তবে তা যেহেতু নিরেট আগুনের উপাদানে গঠিত, তাই তারা মাটির উপাদানে গঠিত মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। নীচে বর্ণিত এ আয়াতটি এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত করে ঃ

إِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ

"শয়তান ও তার দলবল এমন অবস্থান থেকে তোমাদের দেখছে যেখানে তোমরা তাদের দেখতে পাও না" (আল–আ'রাফ–২৭)।

অনুরূপভাবে জিনদের দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়া, অতি সহজেই বিভিন্ন আকার–আকৃতি গ্রহণ করা এবং যেখানে মাটির উপাদানে গঠিত বস্তুসমূহ প্রবেশ করতে পারে না, কিংবা প্রবেশ করলেও তা অনুভূত হয় বা দৃষ্টি গোচর হয়, সেখানে তাদের প্রবেশ অনুভূত বা দৃষ্টিগোচর না হওয়া—এসবই এ কারণে সম্ভব ও বোধগম্য যে, প্রকৃতই তারা আগুনের সৃষ্টি।

এ থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা যায় তা হচ্ছে, জিনরা মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টিই শুধু নয়, বরং তাদের সৃষ্টি উপাদানই মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদরাজি এবং চেতন পদার্থসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যারা জিনদেরকে মানুষেরই একটি শ্রেণী বলে মনে করে এ

আয়াত স্পষ্ট ভাষায় তাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করছে। তারা এর ব্যাখ্যা করে বলেন, মাটি থেকে মানুষকে এবং আগুন থেকে জিনকে সৃষ্টি করার অর্থ প্রকৃত পক্ষে দুই শ্রেণীর মানুষের মেজাজের পার্থক্য বর্ণনা করা। এক প্রকারের মানুষ নম্র মেজাজের হয়ে থাকেন। সত্যিকার অর্থে তারাই মানুষ। আরেক প্রকারের মানুষের মেজাজ হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত গরম। তাদের মানুষ না বলে শয়তান বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের তাফসীর নয়, কুরআনের বিকৃতি সাধন করা। উপরে ১৪ নম্বর টীকায় আমরা দেখিয়েছি যে, কুরআন নিজেই মাটি দ্বারা মানুষের সৃষ্টির অর্থ কতটা স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। বিস্তারিত এসব বিবরণ পড়ার পর কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি এর এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে যে, এসব কথার উদ্দেশ্য শুধু উত্তম মানুষদের নম্র মেজাজ হওয়ার প্রশংসা করা? তার পরেও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষের মগজে একথা কি করে আসতে পারে যে, মানুষকে পঁচা আঠাল মাটির শুকনো ঢিলা থেকে সৃষ্টি করা এবং জিনদেরকে নিরেট অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করার অর্থ একই মানব জাতির দু'টি ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের ব্যক্তিদের বা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র নৈতিক গুণাবলীর পার্থক্য বর্ণনা করা? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াতের তাফসীর, টীকা–৫৩)।

১৬. এখানে ক্ষেত্র অনুসারে آلاء শব্দের অর্থ "অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিক সমূহই অধিক উপযোগী। তবে এর মধ্যে নিয়ামতের বিষয়টিও অন্তরভুক্ত। মাটি থেকে মানুষ এবং আগুনের শিখা থেকে জিনের মত বিস্ময়কর জীবকে অস্তিত্ব দান করা যেমন আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর ব্যাপার। তেমনি এ দু'টি সৃষ্টির জন্য এটাও এক বিরাট নিয়ামত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, বরং প্রত্যেককে এমন আকার আকৃতি দান করেছেন, প্রত্যেকের মধ্যে এমন সব শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন যার সাহায্যে তারা পৃথিবীতে বড় বড় কাজ সম্পন্ন করার যোগ্য হয়েছে। জিনদের সম্পর্কে আমাদের কাছে বেশী তথ্য না থাকলেও মানুষ তো আমাদের সামনে বিদ্যমান। মানুষকে মানুষের মস্তিষ্ক দেয়ার পরে যদি মাছ, পাখি অথবা বানরের দেহ দান করা হতো তাহলে সেই দেহ নিয়ে কি সে ঐ মস্তিষ্কের উপযোগী কাজ করতে পারতো? তাহলে এটা কি আল্লাহর বিরাট নিয়ামত নয় যে, মানুষের মস্তিষ্কে তিনি যে সব শক্তি দিয়েছেন তা কাজে লাগানোর জন্য সর্বাধিক উপযোগী দেহও তাকে দান করেছেন? এক দিকে এ হাত, পা, চোখ, কান, জিহ্বা ও দীর্ঘ দেহ এবং অপরদিকে এ জ্ঞান–বুদ্ধি, চিন্তা ও ধ্যান–ধারণা, আবিষ্কার ও যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা, শৈল্পিক নৈপুন্য এবং কারিগরী যোগ্যতা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বুঝতে পারবেন এ সবের স্রষ্টা এসবের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তা যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়তো। এসব জিনিসই আবার আল্লাহ তা'আলার মহত গুণাবলীর প্রতি ইংগিত করে। জ্ঞান–বুদ্ধি, সৃষ্টি নৈপুন্য, অপরিসীম দয়া এবং পূর্ণমাত্রার সৃষ্টিক্ষমতা ছাড়া মানুষ ও জিনের মত এমন জীব কি করে সৃষ্টি হতে পারতো? আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মতৎপর অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক নিয়ম এরূপ অনুপম ও বিস্ময়কর সৃষ্টিকর্ম কি করে সম্পন্ন করতে পারে?

১৭. দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ শীত কালের সবচেয়ে ছোট দিন এবং গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে বড় দিনের উদয়াচল ও আস্তাচলও হতে পারে। আবার পৃথিবীর দুই

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

দু'টি সমুদ্রকে তিনি পরস্পর মিলিত হতে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল হয়ে আছে যা তারা অতিক্রম করে না[১৯] *হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের অসীম শক্তির কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিক অস্বীকার করবে?*

এই উভয় সমুদ্র থেকেই মুক্তা ও প্রবাল[২০] *পাওয়া যায়।*[২১] *হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের কুদরতের কোন্ কোন্ পরিপূর্ণতা অস্বীকার করবে?*[২২]

সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত উঁচু ভাসমান জাহাজসমূহ তাঁরই।[২৩] *অতএব, হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?*[২৪]

গোলার্ধের উদয়াচল ও অস্তাচলও হতে পারে। শীত মৌসুমের সর্বাপেক্ষা ছোট দিনে সূর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। অপর দিকে গ্রীষ্মের সর্বাপেক্ষা বড় দিনে অতি বিস্তৃত কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। প্রতি দিন এ উভয় কোণের মাঝে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে কুরআনের অন্য এক স্থানে (المعارج : ٤٠) رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ বলা হয়েছে। অনুরূপ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য উদয় হয় ঠিক সে সময় অন্য গোলার্ধে তা অস্ত যায়। এভাবেও পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল ও অস্তাচল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাকে এ দু'টি উদয়াচল ও অস্তাচলের রব বলার কয়েকটি অর্থ আছে। এক, তাঁর হুকুমেই সূর্যের উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়া এবং সারা বছর ধরে তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকার এই ব্যবস্থা চালু আছে। দুই, পৃথিবী ও সূর্যের মালিক ও শাসক তিনি। এ দু'টির রব যদি ভিন্ন ভিন্ন হতো তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সূর্যের এ উদয়াস্তের ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো এবং স্থায়ীভাবে কি করে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারতো। তিন, এ দুই উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক ও পালনকর্তাও তিনি। উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মালিকানাভুক্ত, তিনিই তাদেরকে প্রতিপালন করছেন এবং প্রতিপালনের জন্যই তিনি ভূ-পৃষ্ঠে সূর্য অস্ত যাওয়ার এবং উদয় হওয়ার এ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা চালু রেখেছেন।

১৮. এখানেও পরিবেশ ও ক্ষেত্র অনুসারে آلاء শব্দের সর্বাধিক স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় "অসীম ক্ষমতা"। তবে তার সাথে এর অর্থ নিয়ামত ও মহৎ গুণাবলী হওয়ার দিকটাও বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা সূর্যের উদয়াস্তের এই নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এটা তাঁর একটা বড় নিয়ামত। কারণ, এর বদৌলতেই নিয়মিতভাবে মৌসূমের পরিবর্তন ঘটে থাকে। আর মৌসূমের পরিবর্তনের সাথে মানুষ, জীবজন্তু, ও উদ্ভিদরাজি সবকিছুর অসংখ্য স্বার্থ জড়িত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যেসব সৃষ্টিকুলকে সৃজন করেছেন, তাদের প্রয়োজনের বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে নিজের অসীম ক্ষমতায় এসব ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিয়েছেন এটাও তাঁরই দয়া, রবুবিয়াত ও সৃষ্টি কৃশলতা।

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফুরকান, টীকা–৬৮।

২০. মূল আয়াতে مَرْجَان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস, কাতাদা, ইবনে যায়েদ ও দাহ্হাক (রা)–এর মতে এর অর্থ মুক্তা। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আরবীতে এ শব্দটি প্রবাল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২১. মূল আয়াতের ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে يَخْرُجُ مِنْهُمَا "উভয় সমুদ্র থেকেই পাওয়া যায়"। কেউ কেউ এতে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, মুক্তা ও প্রবাল পাথর তো কেবল লবণাক্ত পানিতেই পাওয়া যায়। সুতরাং লবণাক্ত ও সুপেয় উভয় প্রকারের পানি থেকেই এ দু'টি পাওয়া যায় তা কি করে বলা হলো? এর জবাব হচ্ছে, মিঠা ও লবণাক্ত উভয় প্রকার পানিই সমুদ্রে জমা হয়। অতএব যদি বলা হয়, একত্রে সঞ্চিত এ পানি থেকে এ গুলো পাওয়া যায় কিংবা যদি বলা হয়, তা উভয় প্রকার পানি থেকেই পাওয়া যায় তাহলে কথা একই থেকে যায়। তাছাড়া আরো গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যদি প্রমাণিত হয় যে, মুক্তা ও প্রবাল পাথর সমুদ্র গর্ভে এমন স্থানে উৎপন্ন হয় যেখানে তার গভীর তলদেশে মিঠা পানির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তার সৃষ্টি ও পরিণতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যুগপৎ উভয় প্রকার পানির ভূমিকা ও অবদান আছে তাহলে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। বাহরাইনে যেখানে সুপ্রাচীন কাল থেকে মুক্তা আহরণ করা হয় সেখানে উপসাগরের তলদেশে মিঠা পানির ঝর্ণা প্রবাহিত আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২২. এখানেও آلاء শব্দের দ্বারা যদিও আল্লাহর অসীম ক্ষমতার' দিকটিই বেশী স্পষ্ট তা সত্ত্বেও নিয়ামত ও মহত গুণাবলী অর্থটাও অস্পষ্ট নয়।। এটা আল্লাহর নিয়ামত যে, এসব মূল্যবান বস্তু সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া এটা তাঁর প্রতিপালক সুলভ মহত গুণ যে, তার যে সৃষ্টিকে তিনি রূপ ও সৌন্দর্যের পিপাসা দিয়েছেন সে পিপাসা নিবারণের জন্য তিনি তাঁর পৃথিবীতে নানা রকমের সুন্দর বস্তুও সৃষ্টি করেছেন।

২৩. অর্থাৎ এসব সমুদ্রগামী জাহাজ তাঁরই অসীম ক্ষমতায় সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই মানুষকে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য জাহাজ নির্মাণের যোগ্যতা দান করেছেন আর তিনিই পানিকে এমন নিয়ম–কানুনের অধীন করে দিয়েছেন যার কারণে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষ চিরে পাহাড়ের ন্যায় বড় বড় জাহাজের চলাচল সম্ভব হয়েছে।

২৪. এখানে آلاء শব্দের মধ্যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ অর্থটি স্পষ্ট। তবে উপরের ব্যাখ্যা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এর অসীম ক্ষমতা ও উত্তম গুণাবলী প্রকাশের দিকটিও বর্তমান।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

২ রুকূ'

এ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই[২৫] ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। অতএব, হে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ পূর্ণতাকে অস্বীকার করবে?[২৬] পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলে যা-ই আছে সবাই তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করছে। প্রতি মুহূর্তে তিনি নতুন নতুন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত।[২৭] হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মহত গুণাবলী অস্বীকার করবে?[২৮]

২৫. এখান থেকে ৩০ আয়াত পর্যন্ত জিন ও মানুষকে দু'টি মহা সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

এক ঃ তোমরা নিজেরাও অবিনশ্বর নও, সেই সব সাজ-সরঞ্জামও চিরস্থায়ী নয়, যা তোমরা এ পৃথিবীতে ভোগ করছো। অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী শুধুমাত্র মহা সম্মানিত ও সুমহান আল্লাহর সত্তা, এ বিশাল বিশ্ব-জাহান যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যাঁর বদান্যতায় তোমাদের ভাগ্যে এসব নিয়ামত জুটেছে। এখন যদি তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ "আমার চেয়ে কেউ বড় নেই" এই গর্বে গর্বিত হয় তাহলে এটা তার বুদ্ধির সংকীর্ণতা ছাড়া কিছুই নয়। কোন নির্বোধ যদি তার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজায়, কিংবা কতিপয় মানুষ তার কর্তৃত্ব স্বীকার করায় সে তাদের খোদা হয়ে বসে, তাহলে তার এ মিথ্যার বেসাতী কত দিন চলতে পারে? মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পৃথিবীর অনুপাত যেখানে মটরশুটির দানার মতও নয় তার এক নিভৃত কোণে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ষাট বছর যে কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চলে এবং তারপরই অতীত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় তা এমন কোন্ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যার জন্য কেউ গর্ব করতে পারে?

দুই ঃ যে গুরুত্বপূর্ণ মহাসত্য সম্পর্কে জিন ও মানুষ—এ দু'টি সৃষ্টিকে সাবধান করা হয়েছে তা হচ্ছে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর যেসব সত্তাকেই উপাস্য, বিপদে রক্ষাকারী ও অভাব মোচনকারী হিসেবে গ্রহণ করে থাক তারা ফেরেশতা, নবী-রসূল, অলী-দরবেশ কিংবা চন্দ্র-সূর্য বা অন্য কোন সৃষ্টি যাই হোক না কেন তাদের কেউই তোমাদের কোন প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়। অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ওরা নিজেরাই তো মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাদের নিজেদের হাতই তার সামনে প্রসারিত। তারা নিজেদের ক্ষমতায় নিজেদের বিপদই যেখানে দূর করতে পারেন সেখানে সে তোমাদের বিপদ মোচন কি করে করবে? পৃথিবী থেকে আকাশ

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

ওহে পৃথিবীর দুই বোঝা[২৯] তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি অতি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করবো।[৩০] (তারপরে দেখবো) তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করো?[৩১] হে জিন ও মানব গোষ্ঠী, তোমরা যদি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সীমা পেরিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পার তাহলে গিয়ে দেখ। পালাতে পারবে না, এ জন্য বড় শক্তি প্রয়োজন।[৩২] তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে? (যদি পালানোর চেষ্টা করো তাহলে) তোমাদের প্রতি আগুনের শিখা এবং ধোঁয়া[৩৩] ছেড়ে দেয়া হবে তোমরা যার মোকাবিলা করতে পারবে না। হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?

মণ্ডল পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত এই মহাবিশ্বে যা কিছু হচ্ছে, শুধু এক আল্লাহর নির্দেশেই হচ্ছে। মহান এ কর্মকাণ্ডে আর কারো কোন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য নেই। তাই কোন ব্যাপারেই সে কোন বান্দার ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

২৬. পরিবেশ ও ক্ষেত্র থেকে স্পষ্ট যে, آلاء শব্দটি এখানে পরিপূর্ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নশ্বর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকেই তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় পেয়ে বসে এবং নিজের ক্ষুদ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে অবিনশ্বর মনে করে গর্বে স্ফীত হয়ে উঠে সে মুখে না বললেও নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা সে বিশ্বপালনকর্তা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে অবশ্যই অস্বীকার করে। তার গর্ব আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থী তথা অস্বীকৃতি। নিজের মুখে সে পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবীই করে কিংবা মনের মধ্য যে দাবী সুপ্ত রাখে তা পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত দাবীদারের পদমর্যাদা ও সম্মানকে অস্বীকার করার শামিল।

২৭. অর্থাৎ মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে তাঁরই কর্মতৎপরতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা চলছে। কাউকে তিনি মারছেন আবার কাউকে জীবন দান করছেন। কারো উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কারো পতন ঘটাচ্ছেন, কাউকে আরোগ্য দান করছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করছেন, কাউকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করছেন আবার সাতার

কেটে চলা কাউকে নিমজ্জিত করছেন। সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকে নানাভাবে রিযিক দান করছেন। অসংখ্য বস্তুকে নতুন নতুন স্টাইল, আকার–আকৃতি ও গুণ–বৈশিষ্ট দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তাঁর পৃথিবী কখনো এক অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে না। তাঁর পরিবেশ ও অবস্থা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার স্রষ্টা তাকে প্রতিবারই একটি নতুন রূপে সজ্জিত করেন যা পূর্বের সব আকার–আকৃতি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

২৮. এখানে آلاء শব্দের 'গুণাবলী' অর্থটিই অধিক উপযুক্ত বলে মনে হয়। কোন ব্যক্তি যখনই কোন প্রকার শির্কে লিপ্ত হয় তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কোন না কোন গুণকে অস্বীকার করে। কেউ যদি বলে অমুক ব্যক্তি আমাকে রোগমুক্ত করেছেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ রোগ আরোগ্যকারী নন, বরং সেই ব্যক্তিই রোগ আরোগ্যকারী। কেউ যদি বলে, অমুক বুযুর্গ ব্যক্তির অনুগ্রহে আমি রুজি লাভ করেছি। তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে যেন বললো, আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা নন বরং সেই বুযুর্গ ব্যক্তি রিযিক দাতা। কেউ যদি বলে, অমুক আস্তানা থেকে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, তাহলে সে যেন বললো, পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম চলছে না, বরং ঐ আস্তানার হুকুম চলছে। মোটকথা প্রতিটি শিরক্‌মূলক আকীদা ও শির্‌কমূলক কথাবার্তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আল্লাহর গুণাবলীর অস্বীকৃতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। শির্‌কের অর্থই হচ্ছে ব্যক্তি অন্যদের সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী, অদৃশ্য জ্ঞাতা, স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনকারী, সর্বশক্তিমান এবং খোদায়ীর অন্য সব গুণে গুণান্বিত বলে আখ্যায়িত করছে এবং এককভাবে আল্লাহই যে এসব গুণে গুণান্বিত তা অস্বীকার করছে।

২৯. মূল আয়াতে ثَقَلَانِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল ধাতু ثقل । ثقل অর্থ বোঝা। আর ثقل বলা হয় এমন বোঝাকে যা সওয়ারী বা বাহনের ওপর চাপানো হয়েছে। ثقلين শব্দের শাব্দিক অনুবাদ হবে "দুই বোঝা" এখানে এ শব্দটি জিন ও মানুষকে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এ দু'টি জাতিকেও পৃথিবী পৃষ্ঠে বোঝা হিসেবে চাপানো হয়েছে এবং পূর্ব থেকে সেই সব জিন ও মানুষকে উদ্দেশ করেই কথা বলা হচ্ছে যারা তাদের রবের আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তী ৪৫ আয়াতেও তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সে জন্য তাদেরকে اَيُّهَا الثَّقَلَانِ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টা যেন তাঁর এই দু'টি অযোগ্য সৃষ্টিকে বলছেন ঃ তোমরা যারা আমার পৃথিবীর ওপর বোঝা হয়ে আছ, তোমাদের সাথে বুঝাপড়ার জন্য অবসর গ্রহণ করবো।

৩০. এখন আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যস্ত যে এসব অবাধ্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ তিনি পান না, একথার অর্থ তা নয়। প্রকৃতপক্ষে একথার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ একটি বিশেষ সময়সূচী নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেই সময়সূচী অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি এ পৃথিবীতে মানুষ ও জিনদের বংশের পর বংশ সৃষ্টি করতে থাকবেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর এ পরীক্ষাগারে এনে কাজ করার সুযোগ দেবেন। তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার এ ধারা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সে সময়ে বিদ্যমান সমস্ত জিন ও মানুষকে একই সময়ে হঠাৎ ধ্বংস করে দেয়া হবে। তারপর মানব ও জিন উভয়

জাতির জবাবদিহির জন্য তার কাছে আরো একটি সময় নির্দিষ্ট করা আছে। সেই সময় জিন ও মানব জাতির সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ লোকদেরকে পুনরায় জীবিত করে একই সময় একত্রিত করা হবে। এ সময়সূচীর প্রতি লক্ষ রেখে বলা হয়েছে, এখনো আমি প্রথম পর্যায়ের কাজ করছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময় এখনো আসেনি। তাই তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে ঘাবড়াবে না। খুব শীঘ্রই সে সময়টি এসে যাচ্ছে যখন আমি তোমাদের খবর নেয়ার জন্য অবসর নেব। এখানে অবসরহীনতার অর্থ এই নয় যে, এখন কোন কাজ আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ব্যস্ত রেখেছে যে, অন্য কাজ করার অবকাশই তিনি পাচ্ছেন না। বরং এর ধরন ও প্রকৃতি হচ্ছে, যেন কেউ বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়সূচী প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং সেই অনুসারে যে কাজের সময় এখনো আসেনি সে কাজ সম্পর্কে বলছেন, আমি সে কাজের জন্য আদৌ প্রস্তুত নই।

৩১. এখানে آلاء শব্দটিকে "অসীম ক্ষমতা" অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ করলে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টি অর্থই সঠিক বলে মনে হয়। একটি অর্থ গ্রহণ করলে তার সারকথা দাঁড়ায় এই যে, আজ তোমরা আমার নিয়ামতের নাশোকরী করছো এবং কুফর, শির্‌ক, নাস্তিকতা, পাপাচার ও নাফরমানীর বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে নানা রকমের নেমকহারামী করে চলেছো। কিন্তু কাল যখন জবাবদিহির পালা আসবে তখন দেখবো আমার কোন্‌ কোন্‌ নিয়ামতকে তোমরা আকস্মিক দুর্ঘটনা কিংবা নিজেদের যোগ্যতার ফল বা কোন দেব-দেবী অথবা বুযুর্গের অনুগ্রহের দান বলে প্রমাণ করো। অন্য অর্থটি গ্রহণ করলে তার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, আজ তোমরা কিয়ামত, হাশর-নাশর, হিসেব-নিকেশ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো এবং নিজ থেকেই এ অমূলক ধারণা নিয়ে বসে আছ যে, এরূপ হওয়া সম্ভবই নয়। কিন্তু আমি যখন তোমাদেরকে পরিবেষ্ঠিত করে ধরে আনবো এবং আজ যা তোমরা অস্বীকার করছো তা সবই তোমাদের সামনে এসে হাজির হবে সে সময় আমি দেখে নেব তোমরা আমার কোন্‌ কোন্‌ অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করে থাকো।

৩২. যমীন ও আসমান অর্থ গোটা সৃষ্টিজগত অথবা অন্য কথায় আল্লাহর প্রভুত্ব। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য তোমাদের নেই। যে জবাবদিহি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে তার সময় যখন আসবে তখন তোমরা যেখানেই থাক না কেন পাকড়াও করে আনা হবে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর প্রভুত্বাধীন এলাকা থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। তোমরা যদি মনে এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাক তাহলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেখ।

৩৩. মূল আয়াতে شواظ ও نحاس শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। এমন নিরেট অগ্নি-শিখাকে شُوَاظ বলা হয় যার মধ্যে ধোঁয়া থাকে না আর এমন নিরেট ধোঁয়াকে نحاس বলা হয় যার মধ্যে অগ্নিশিখা থাকে না। জিন ও মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবে তখন তাদের প্রতি একের পর এক এ দু'টি জিনিস নিক্ষেপ করা হবে।

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي
وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ
بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

অতপর (কি হবে সেই সময়) যখন আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং লাল চামড়ার মত লোহিত বর্ণ ধারণ করবে?[৩৪] হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতা অস্বীকার করবে?[৩৫]

সে দিন কোন মানুষ ও কোন জিনকে তার গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না।[৩৬] তখন (দেখা যাবে) তোমরা দুই গোষ্ঠী তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করো।[৩৭] সেখানে চেহারা দেখেই অপরাধীকে চেনা যাবে এবং তাদেরকে মাথার সম্মুখভাগের চুল ও পা ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে। সেই সময় তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে? সেই (সময় বলা হবে) এতো সেই জাহান্নাম অপরাধীরা যা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতো। তারা ঐ জাহান্নাম ও ফুটন্ত টগবগে পানির উৎসের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকবে।[৩৮] তারপরেও তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?[৩৯]

৩৪. এখানে কিয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ মহাকাশ বা মহাবিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ না থাকা, মহাকাশের সমস্ত সৌরজগতের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া, মহাজগতের সমস্ত নিয়ম–শৃংখলা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আরো বলা হয়েছে, সে সময় আসমান লাল চামড়ার মত বর্ণধারণ করবে। অর্থাৎ সেই মহাপ্রলয়ের সময় যে ব্যক্তি পৃথিবী থেকে আসমানের দিকে তাকাবে তার মনে হবে গোটা উর্ধজগতে যেন আগুন লেগে গিয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ আজ তোমরা বলছো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত করতে সক্ষম নন। কিন্তু যখন তা

সংঘটিত হবে এবং আজ তোমাদেরকে যে খবর দেয়া হচ্ছে নিজের চোখে তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহর কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?

৩৬. পরবর্তী আয়াতের অর্থাৎ "চেহারা দেখেই সেখানে অপরাধীদের চেনা যাবে" কথাটিই এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সেই মহাসমাবেশে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষকে একত্রিত করা হবে। অপরাধীদের চেনার জন্য সেখানে জনে জনে একথা জিজ্ঞেস করার দরকার হবে না যে, তারা কে কে অপরাধী কিংবা কোন জিন ও মানুষকে, সে অপরাধী কিনা একথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়বে না। অপরাধীদের শুষ্ক ম্লান মুখ ভীতি ভরা দু'টি চোখ, অস্থির অপ্রস্তুত ভাবভঙ্গি এবং ঘর্মসিক্ত হওয়াই তাদের অপরাধী হওয়ার গোপন রহস্য উদঘাটিত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। অপরাধী ও নিরপরাধ এ উভয় শ্রেণীর লোকের একটি দল যদি পুলিশের কবলে পড়ে তাহলে নিরপরাধ লোকদের চেহারার প্রশান্তি ও নিরুদ্বিগ্নতা এবং অপরাধীদের চেহারার অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা প্রথম দর্শনেই বলে দেবে ঐ দলে কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ। দুনিয়াতে এ নিয়ম কোন কোন সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কারণ দুনিয়ার পুলিশের ন্যায়নিষ্ঠতার ব্যাপারে মানুষ আস্থা রাখতে পারে না। তাদের হাতে বরং অপরাধীদের চেয়ে নিরপরাধরাই বারবার বেশী করে হয়রানির শিকার হয়। তাই পৃথিবীতে পুলিশের কবলে পড়ে ভদ্র ও নিরপরাধ লোকদের অধিক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া সম্ভব। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিটি ভদ্র ও নিরপরাধ ব্যক্তিরই পূর্ণ আস্থা থাকবে। এ ধরনের অস্থিরতা ও উদ্বেগ থাকবে কেবল তাদেরই যাদের নিজের বিবেকই তাদের অপরাধী হওয়া সম্পর্কে অবহিত থাকবে। হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়া মাত্র তারা এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, এখন তাদের সেই দুর্ভাগ্য এসে গিয়েছে যাকে তারা অসম্ভব ও সন্দেহজনক মনে করে দুনিয়াতে অপরাধ করে বেড়িয়েছে।

৩৭. কুরআনের দৃষ্টিতে অপরাধের প্রকৃত ভিত্তি হলো, বান্দা আল্লাহর দেয়া যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সেসব নিয়ামত সম্পর্কে তার এ ধারণা পোষণ যে, তা কারো দেয়া নয়, বরং সে এমনিই তা লাভ করেছে। কিংবা এসব নিয়ামত আল্লাহর দান নয়, বরং নিজের যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের ফল। অথবা একথা মনে করা যে, এসব নিয়ামত আল্লাহর দান বটে, কিন্তু সেই আল্লাহর তাঁর বান্দার ওপর কোন অধিকার নেই। অথবা আল্লাহ নিজে তার প্রতি এসব অনুগ্রহ দেখাননি। বরং অন্য কোন সত্তা তাকে দিয়ে তা করিয়েছেন। এসব ভ্রান্ত ধ্যান–ধারণার ভিত্তিতে মানুষ আল্লাহ বিমুখ এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে এমন সব কাজ–কর্ম করে আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন এবং সেসব কাজ করে না আল্লাহ যা করতে আদেশ দিয়েছেন। এ বিচারের প্রতিটি অপরাধ ও প্রতিটি গোনাহর মূলগতভাবে আল্লাহ তা'আলার দান ও অনুগ্রহের অস্বীকৃতি ও অবমাননা। এ ক্ষেত্রে কেউ মুখে তা মানুক বা অস্বীকার করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু প্রকৃতই যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি ও অবমাননার ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি পোষণ করে না, বরং তার মনের গভীরে তার সত্য হওয়ার বিশ্বাস সদা বর্তমান, মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন সময় তার দ্বারা ত্রুটি–বিচ্যুতি হয়ে গেলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا
أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

৩ রুকূ'

আর যারা তাদের প্রভুর সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ভয় পায়[৪০] তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে দু'টি করে বাগান।[৪১] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে?[৪২] তরুতাজা লতাপাতা ও ডালপালায় ভরা। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? উভয় বাগানে দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? উভয় বাগানের প্রতিটি ফলই হবে দু' রকমের।[৪৩]

করার চেষ্টা করে। এ জিনিসটি তাকে অস্বীকারকারীদের অন্তরভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া আর সব অপরাধীই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অবিশ্বাসকারী এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহসমূহ অস্বীকারকারী। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ যখন তোমরা অপরাধী হিসেবে ধরা পড়বে তখন আমি দেখবো তোমরা আমার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করছো। একথাটিই সূরা "তাকাসূরে" এভাবে বলা হয়েছে ঃ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল সেদিন ঐ গুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হবে, আমিই তোমাদেরকে এসব নিয়ামত দিয়েছিলাম কিনা! ঐ সব নিয়ামত লাভ করার পর তোমরা তোমাদের অনুগ্রহকারীর প্রতি কি আচরণ করেছিলে, আর ঐ সব নিয়ামতকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলে?

৩৮. অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে বারবার পিপাসার্ত হওয়ার কারণে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত করুণ। দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পানির ঝর্ণার দিকে যাবে। কিন্তু সেখানে পাবে টগবগে গরম পানি যা পান করে পিপাসা মিটবে না। এভাবে জাহান্নাম ও পানির ঝর্ণাসমূহের মাঝে যাতায়াত করেই তাদের জীবন কাটতে থাকবে।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কিয়ামত সংঘটিত করতে পারেন, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আরেকটি জীবন দিতে পারেন, তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেন এবং যে জাহান্নামে আজ তোমরা শাস্তি ভোগ করছো তাও বানাতে পারেন, তখনও কি তোমরা একথা অস্বীকার করতে পারবে?

৪০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছে, সবসময় যার এ উপলব্ধি ছিল যে, পৃথিবীতে আমাকে দায়িত্বহীন এবং লাগাম বিহীন উটের মত মুক্ত স্বাধীন করে ছেড়ে দেয়া হয়নি। আমাকে একদিন আমার রবের সামনে দাঁড়াতে হবে

এবং নিজের সব কাজ–কর্মের হিসেব দিতে হবে। এ আকীদা–বিশ্বাস যার মধ্যে থাকবে অনিবার্যভাবেই সে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে রক্ষা পাবে, এলোপাথাড়ি যে কোন পথ ধরেই চলতে শুরু করবে না। ন্যায় ও অন্যায়, জুলুম ও ইনসাফ পাক ও না–পাক এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করবে। আর জেনে বুঝে আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। পরে যে প্রতিদানের কথা বলা হচ্ছে এটাই তার প্রকৃত কারণ।

৪১. জান্নাত শব্দের শাব্দিক অর্থ বাগান। আখেরাতের জীবনে সৎমানুষদেরকে যেখানে রাখা হবে কুরআন মজীদের কোথাও সেই পুরো স্থানটাকে জান্নাত বলা হয়েছে। অর্থাৎ তা যেন সবটাই একটা বাগান। কোথাও বলা হয়েছে তাদের জন্য থাকবে বাগানসমূহ যার পাদদেশ দিয়ে নদী ও ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। এর অর্থ সেই বিশাল বাগানের মধ্যে ছোট ছোট অনেক বাগান হবে। আর এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সেই বিশাল বাগানের মধ্যে প্রত্যেক নেক্কার ব্যক্তিকে দু'টি করে বাগান দেয়া হবে। ঐ দু'টি বাগান কেবল তার জন্যই নির্দিষ্ট হবে। তার মধ্যে থাকবে তার প্রাসাদ। সেখানে সে তার চাকর–বাকর ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে বাদশাহী ঠাটবাট ও জাঁকজমকের সাথে অবস্থান করবে। তাকে যেসব সাজ–সরঞ্জাম দেয়ার কথা পরে বলা হয়েছে সেখানেই তাকে তা সরবরাহ করা হবে।

৪২. এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত آلاء শব্দটি নিয়ামতরাজি ও অসীম ক্ষমতা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে মহত গুণাবলীর দিকটিও প্রতিভাত হয়েছে। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হলে বর্ণনার এ ধারাবাহিকতার মধ্যে এ বাক্যাংশটি বারবার উল্লেখ করার অর্থ হবে তোমরা অস্বীকার করতে চাইলে করতে থাক। আল্লাহভীরু লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে এসব নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবেন। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে তার সারকথা হবে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তৈরী করা এবং সেখানে তাঁর নেক বান্দাহদেরকে এসব নিয়ামত দান করা অসম্ভব হয়ে থাকলে হোক। কিন্তু আল্লাহ নিশ্চিতভাবে তা করতে সক্ষম এবং তিনি অবশ্যই তা করবেন। তৃতীয় অর্থ অনুসারে এর তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা মনে কর আল্লাহ তা'আলা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করেন না। তোমাদের কথা অনুসারে এর অর্থ দাঁড়ায়, তিনি এ বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ঠিকই। কিন্তু এখানে কেউ জুলুম করলো না ইনসাফ, ন্যায় ও সত্যের জন্য কাজ করলো না বাতিলের জন্য এবং অকল্যাণের প্রসার ঘটালো না কল্যাণের তার কোন পরোয়াই তিনি করেন না। তিনি জালেমকেও শাস্তি দেন না, মজলুমের ফরিয়াদও শোনেন না। ভালো কাজের মূল্যও বুঝেন না, মন্দ কাজকেও ঘৃণা করেন না। তোমাদের ধারণা অনুসারে তিনি অক্ষমও বটে। তিনি যমীন ও আসমান ঠিকই বানাতে পারেন, কিন্তু জালেমদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দোজখ এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদের প্রতিদান দেয়ার জন্য জান্নাত নির্মাণ করতে সক্ষম নন। তাঁর এসব মহত গুণাবলীকে আজ যত ইচ্ছা তোমরা অস্বীকার করতে থাকো। কাল যখন তিনি সত্যি সত্যি জালেমদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে এসব নিয়ামত দান করবেন, সে সময়ও কি তোমরা তার এসব গুণাবলী অস্বীকার করতে পারবে?

৪৩. একথার একটা অর্থ হতে পারে এই যে, উভয় বাগানের ফলই হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্টপূর্ণ। এক বাগানে গেলে গাছের শাখা প্রশাখায় প্রচুর ফল দেখতে

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٣ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝٥٤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٥ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝٥٦ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٧ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝٥٨ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٥٩

তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? জান্নাতের বাসিন্দারা এমন সব ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে যার আবরণ হবে পুরু রেশমের[৪৪] এবং বাগানের ছোট ছোট শাখা–প্রশাখা ফলভারে নুয়ে পড়তে থাকবে। তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে লজ্জাবনত চক্ষু বিশিষ্টা ললনারা[৪৫] যাদেরকে এসব জান্নাতবাসীদের আগে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।[৪৬] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? এমন সুদর্শনা, যেমন হীরা এবং মুক্তা। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে?

পাবে। অপর বাগানে গেলে সেখানকার ফলের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখতে পাবে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে এর প্রতিটি বাগানের এক প্রকারের ফল হবে তার পরিচিত। তার সাথে সে দুনিয়াতেও পরিচিত ছিল—যদিও তা স্বাদে দুনিয়ার ফল থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ হবে। আর আরেক প্রকার ফল হবে বিরল ও অভিনব জাতের—দুনিয়ায় যা সে কোন সময় কল্পনাও করতে পারেনি।

৪৪. অর্থাৎ তার আবরণই যেখানে এরূপ সেখানে তার ওপরের আচ্ছাদনকারী চাদর কেমন হবে তা অনুমান করে দেখ।

৪৫. নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে লজ্জাহীনা ও বাচাল না হওয়া এবং সলজ্জ দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। এ কারণে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের অন্যতম নিয়ামত নারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা না বলে তার লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের প্রশংসা করেছেন। সুন্দরী মেয়েরা তো নারী ও পুরুষের যৌথ ক্লাব–সমূহে এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র চিত্রপুরীতেও সমবেত হয়ে থাকে। আর সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বেছে বেছে সুন্দরী নারীদের নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শুধু বিকৃত রুচিবোধ সম্পন্ন ও দুশ্চরিত্র লোকেরাই এদের ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে। যে সুন্দরী নারী যে কোন কাম দৃষ্টিকে তার সৌন্দর্য ভোগের আহবান জানায় এবং যে কোন বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয় তা কোন ভদ্র ও রুচিবান মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কি হতে পারে?[৪৭] হে জিন ও মানুষ, এরপরও তোমরা তোমাদের রবের মহত গুণাবলীর কোন্ কোন্‌টি অস্বীকার করবে?[৪৮]

ঐ দু'টি বাগান ছাড়া আরো দু'টি বাগান থাকবে।[৪৯] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? নিবিড়, শ্যামল–সবুজ ও তরুতাজা বাগান।[৫০] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। উভয় বাগানের মধ্যে দু'টি ঝর্ণাধারা ফোয়ারার মত উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। সেখানে থাকবে প্রচুর পরিমাণে ফল, খেজুর ও আনার। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে সচ্চরিত্রের অধিকারীনী সুন্দরী স্ত্রীগণ।

৪৬. এর অর্থ, পার্থিব জীবনে কোন নারী কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে থাকুক কিংবা কারো স্ত্রী থেকে থাকুক যৌবনে মৃত্যুবরণ করে থাকুক কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় দুনিয়া ছেড়ে যেয়ে থাকুক, এসব নেক্‌কার নারীরা আখেরাতে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে যুবতী ও কুমারী বানিয়ে দেয়া হবে। সেখানে তাদের মধ্য থেকে যাকেই কোন নেক্‌কার পুরুষের জীবন সঙ্গিনী বানানো হবে জান্নাতে সে তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে আর কারো সাহচর্য লাভ করবে না।

এ আয়াত থেকে একথাটিও জানা যায় যে, নেক্‌কার মানুষের মত নেক্‌কার জিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে মানুষ পুরুষের জন্য যেমন মানুষ নারী থাকবে তেমনি জিন পুরুষদের জন্য জিন নারীও থাকবে। উভয়ের সাথে বন্ধনের জন্য উভয়ের নিজ প্রজাতির জোড়া বাঁধা হবে। কোন ভিন্ন প্রজাতির সৃষ্ট জীবের সাথে তাদের জোড়া বাঁধা হবে না। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই তারা তাদের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সক্ষম নয়। "তাদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শ করবে না" আয়াতে উল্লেখিত একথার অর্থ এ নয় যে, সেখানে নারীরা সবাই হবে মানুষ এবং তাদের জান্নাতী স্বামী স্পর্শ করার

পূর্বে তারা কোন মানুষ বা জিনের স্পর্শ লাভ করবে না। একথার প্রকৃত অর্থ হলো সেখানে জিন ও মানুষ উভয় প্রজাতির নারী থাকবে। তারা সবাই হবে লজ্জাশীলা ও অস্পর্শিতা। কোন জিন নারীও তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে অন্য কোন জিন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না, কোন মানুষ নারীও তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে অন্য কোন মানুষ পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা ও অপবিত্রা হবে না।

৪৭. অর্থাৎ যেসব মানুষ আল্লাহ তা'আলার জন্য সারা জীবন পৃথিবীতে নিজেদের প্রবৃত্তির ওপর বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রেখেছিল, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করে হালালের ওপর সন্তুষ্ট থেকেছে, ফরযকে ফরয মনে করে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে, ন্যায় ও সত্যকে ন্যায় ও সত্য মনে করে হকদারদের হক-সমূহ আদায় করেছে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করে অন্যায় ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে ন্যায় ও কল্যাণকে সমর্থন করেছে। আল্লাহ তাদের এসব ত্যাগ ও কুরবানীকে ধ্বংস ও ব্যর্থ করে দেবেন এবং কখনো এর কোন প্রতিদান তাদের দেবেন না তা কি করে সম্ভব?

৪৮. একথা স্পষ্ট, যে ব্যক্তি জান্নাত ও সেখানকার প্রতিদান ও পুরস্কার অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক উত্তম গুণাবলী অস্বীকার করে। সে আল্লাহকে মানলেও তাঁর সম্পর্কে অনেক খারাপ ধারণা পোষণ করে। তার মতে, আল্লাহ একজন অবিবেচক রাজা যার আইন-কানুন বিহীন রাজত্বে ভাল কাজ করা কোন কিছু পানিতে নিক্ষেপ করার শামিল। সে তাঁকে অন্ধ ও বধির বলে মনে করে। তাঁর বিশাল রাজ্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কে প্রাণ, সম্পদ, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং শ্রমের কুরবানী পেশ করছে সে খবর তিনি আদৌ রাখেন না। কিংবা সে মনে করে, তিনি অনুভূতিহীন ও কোন কিছুর যথাযথ মূল্যায়ণে অক্ষম—যার কাছে ভাল-মন্দের কোন পার্থক্য নেই। অথবা তার মতে, তিনি অক্ষম ও অপদার্থ। তাঁর কাছে নেক কাজের যতই মূল্য থাক না কেন, তার প্রতিদান দেয়ার সাধ্য তাঁর নেই। এ কারণে বলা হয়েছে, আখেরাতে তোমাদের চোখের সামনে যখন নেক কাজের উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে, তখনও কি তোমরা তোমাদের রবের মহত গুণাবলী অস্বীকার করতে পারবে?

৪৯. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হলো ঃ مِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَنِ আরবী ভাষায় دُونَ শব্দটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, কোন উঁচু জিনিসের তুলনায় নীচু হওয়া অর্থে। দুই, কোন উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিসের তুলনায় নিম্নমানের হওয়া অর্থে। তিন, কোন জিনিসের চেয়ে অতিরিক্ত হওয়া অর্থে। অর্থের এ ভিন্নতার কারণে বাক্যাংশের এ অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, এ দু'টি বাগান ছাড়াও প্রত্যেক জান্নাতীকে আরো দু'টি বাগান দেয়া হবে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, এ দু'টি বাগান ওপরে উল্লেখিত বাগান দু'টির তুলনায় অবস্থান ও মর্যাদায় নীচু মানের হবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দু'টি বাগান হয়তো উচ্চস্থানে অবস্থিত হবে এবং এ দু'টি তার নীচে অবস্থিত হবে কিংবা প্রথমোক্ত বাগান দু'টি অতি উন্নতমানের হবে এবং তার তুলনায় এ দু'টি নিম্নমানের হবে। প্রথম সম্ভাবনা মেনে নিলে তার অর্থ হবে, ওপরে যেসব জান্নাতীদের কথা বলা হয়েছে অতিরিক্ত এ দু'টি বাগানও হবে তাদেরই। আর দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে প্রথমোক্ত দু'টি বাগান হবে "মুকাররাবীন" বা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? তাঁবুতে অবস্থানরত হুরগণ।[৫১] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? এসব জান্নাতবাসীদের পূর্বে কখনো কোন মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শও করেনি। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। ঐ সব জান্নাতবাসী সবুজ গালিচা ও সূক্ষ্ম পরিমার্জিত অনুপম ফরাশের[৫২] ওপর হেলান দিয়ে বসবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? তোমার মহিমান্বিত ও দাতা রবের নাম অত্যন্ত কল্যাণময়।

বান্দাদের জন্য এবং এ দু'টি বাগান হবে "আসহাবুল ইয়ামীন"-দের জন্য। দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনাটি যে কারণে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করছে তা হলো, সূরা ওয়াকি'আয় সৎকর্মশীল মানুষদের দু'টি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি "সাবেকীন" বা অগ্রবর্তীগণ। তাদেরকে "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীও বলা হয়েছে। অপরটি "আসহাবুল ইয়ামীন"। তাদেরকে "আসহাবুল মায়মানা" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের উভয় শ্রেণীর জন্য দু'টি আলাদা বৈশিষ্টের জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আবু মূসা আশ'আরী থেকে তাঁর পুত্র আবু বকর যে হাদীস বর্ণনা করেছে সে হাদীসটিও এ সম্ভাবনাকে জোরদার করছে। আবু মূসা আশ'আরী বর্ণিত উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবেকীন অগ্রগামী বা "মুকাররাবীন"—নৈকট্য লাভকারীদের জন্য যে দু'টি জান্নাত হবে তার পাত্র ও আসবাবপত্রসমূহের প্রতিটি জিনিস হবে স্বর্ণের। আর 'তাবেয়ীন' বা "আসহাবুল ইয়ামীন"দের জন্য যে দু'টি জান্নাত হবে তার পাত্র ও আসবাবপত্রসমূহ হবে রৌপ্যের (ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীরে সূরা আর রাহমান)।

৫০. এসব বাগানের পরিচয় দানের জন্য مُدْهَامَّتَانِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। مُدْهَامَّة বলা হয় এমন ঘন নিবিড় শ্যামলতাকে যা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কারণে অনেকটা কাল বর্ণ ধারণ করেছে।

৫১. 'হুর' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্‌ফাতের তাফসীর, টীকা ২৮-২৯ এবং সূরা দুখানের তাফসীর টীকা ৪২। রাজা বাদশাহ ও আমীর উমরাদের

জন্য প্রমোদ কেন্দ্রসমূহে যে ধরনের তাঁবু খাটানো হয়ে থাকে এখানে তাঁবু বলতে সম্ভবত সেই ধরনের তাঁবু বুঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীদের স্ত্রীগণ সম্ভবত তাদের সাথে প্রাসাদে বাস করবে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত প্রমোদ কেন্দ্রসমূহের তাঁবুতে হুরগণ তাদের জন্য আনন্দ স্ফূর্তি ও আরাম-আয়েশের উপকরণ সরবরাহ করবে। আমাদের এ ধারণার ভিত্তি হচ্ছে, প্রথমে উত্তম চরিত্র ও সুদর্শনা স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর স্বতন্ত্রভাবে আবার হুরদের কথা উল্লেখ করার অর্থই হচ্ছে, এরা হবে স্ত্রীদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির নারী। উম্মে সালামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে এ ধারণা আরো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। তিনি বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল পৃথিবীর নারীরাই উত্তম না হুরেরা? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হুরদের তুলনায় পৃথিবীর নারীদের মর্যাদা ঠিক ততটা বেশী যতটা বেশী মর্যাদা আবরণের চেয়ে তার ভিতরের বস্তুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ কারণ, পৃথিবীর নারী নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে এবং ইবাদাত-বন্দেগী করেছে।" (তাবারানী) এ থেকে জানা যায়, যেসব নারীরা দুনিয়াতে ঈমান এনেছিল এবং নেক কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলো তারাই হবে জান্নাতবাসীদের স্ত্রী। তারা নিজেদের ঈমান ও নেক আমলের ফলশ্রুতিতে জান্নাতে যাবে এবং একান্ত নিজস্বভাবেই জান্নাতের নিয়ামত লাভের অধিকারিনী হবে। তারা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুসারে হয় নিজেদের পূর্বতন স্বামীদের স্ত্রী হবে—যদি তারাও জান্নাতবাসী হয়। নয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্য কোন জান্নাতবাসী পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবেন যদি তারা উভয়েই পরস্পরে সাহচর্য ও বন্ধুত্ব পছন্দ করে। এরপর থাকে হুরদের বিষয়টি। তারা নিজেদের কোন নেক কাজের ফলশ্রুতিতে নিজ অধিকারের ভিত্তিতে জান্নাতবাসিনী হবে না। বরং জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের মত একটি নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে যুবতী, সুন্দরী ও রূপবতী নারীর আকৃতি দিয়ে জান্নাতবাসীদেরকে নিয়ামত হিসেবে দান করবেন যাতে তারা তাদের সাহচর্য উপভোগ করতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই তারা জিন বা পরী শ্রেণীর কোন সৃষ্ট জীব হবে না। কারণ, মানুষ কখনো ভিন্ন প্রজাতির সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে অভ্যস্ত ও তৃপ্ত হতে পারে না। এ কারণে খুব সম্ভব তারা হবে সেই সব নিষ্পাপ মেয়ে যারা প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পিতা-মাতাও জান্নাত লাভ করেনি যে, সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ পাবে।

৫২. মূল আয়াতে عبقرى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। জাহেলী যুগের আরবীয় কিচ্ছা-কাহিনীতে জিনদের রাজধানীর নাম ছিল عبقر (আবকার)। বাংলা ভাষায় আমরা যাকে পরীস্থান বলে থাকি। এ কারণে আরবের লোকেরা প্রতিটি উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে عبقرى আবকারী বলতো। অর্থাৎ তা যেন পরীস্থানের বস্তু, দুনিয়ার সাধারণ কোন বস্তু তার সমকক্ষ নয়। এমনকি যে ব্যক্তি অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী, যার দ্বারা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কার্যাদি সম্পন্ন হয় তাদের পরিভাষায় তাকেও (عبقرى) আবকারী বলতো। ইংরেজী (Genius) শব্দটিও এ অর্থেই বলা হয়ে থাকে এ শব্দটিও আবার Geni শব্দ থেকে গৃহীত যা জিন শব্দের সমার্থক। এ কারণে আরববাসীদেরকে জান্নাতের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের অস্বাভাবিক উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হওয়ার ধারণা দেয়ার জন্য عبقرى আবকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।